প্রাগৈতিহাসিক কেচ্ছা-৪

(ভুমিকাঃ মেজর, মাখন, মজু নামের বালকেরা আজ হতে ষাট বছর আগে গাজীপুরের এক গন্ডগ্রামে বনে বাদারে ঘুরে বেড়াত। সে ছিল এক প্রাগৈতিহাসিক কাল। সমাজে মানুষের পাশাপাশি জ্বিন-পরীদেরও অবাধ বিচরণ ছিল। জঙ্গলে বাঘ ছিল, হরিণ ছিল। আর ছিল ডোবা-নালা-বিল-হাওড়ভর্তি অজস্র মাছ। প্রাগৈতিহাসিক সেই সমাজ নগর-সভ্যতার অতল গহ্বরে তলিয়ে গেছে বহুকাল আগে; তবুও হারিয়ে যাওয়া সেই সময় এখনও দীর্ঘশ্বাস ফেলে যায় মনের আকাশে। সেইসব প্রকৃতি-বালকদের রোজনামচার কিছু অংশ স্মৃতিবন্ধ করার প্রয়াসেই অত্র উপাখ্যানগুলির অবতারণা।)

ওলাবিবি-শেতলা বিবিদের রাজত্ব

উত্তর পাড়ার হালট প্রসিদ্ধ জায়গা। বিকেল হলে এখানে সারা গাঁয়ের ছেলেরা জড়ো হয়। হা-ডুডু, গোল্লাছুট, লবনদাড়ি, হাড়ি-ডুগডুগ প্রভৃতি হাজারো রকমের খেলার আসর বসে। শীতকালে হাই স্কুলের ছেলেরা কোট কেটে ভলি বল খেলে। রাহে ভাই ঢাকার মস্তোবড় কলেজে পড়েন, তিনি পর্য্যন্ত ভলি খেলায় যোগ দেন। এ থেকেই বুঝা যায় যে ভলিবল কোন ছোটখাট খেলা নয়, খাস্ ইংরেজদের খেলা।

বিকেলবেলা হালটের দিকে যাচ্ছিলাম, দেখি রাস্তার পাশে একটা কলসী। কে যেন পানি ভরে সেখানে রেখে গেছে। আমার সংগী ছিল মুন্নাফ ও মাখন। মাখন বলল- 'আয় কলসিতে মাটি ভইরা রাখি'। প্রস্তাবটা মন্দ না, ধারে কাছে কেউ যখন নাই তখন পানির মধ্যে কিছু মাটির ঢেলা ফেললে ক্ষতি কী ? প্ল্যানমতো কাজ শেষ করে রওনা দিয়েছি, একটা কথা মনে হতে বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। আমাকে দাড়িয়ে পড়তে দেখে মাখনা বলল- 'খাড়াইলি ক্যান্, জলদি চল্, কেউ আইয়া পড়ব'।

- 'পানির মধ্যে মাটি মিশাইলাম কেউ দ্যাহে নাই। অহন এই পানি খাইয়া যুদি কেউ অসুখ অইয়া মারা যায় আমাগো পাপ অইব না ? মরলে আল্লাহ দোজখে নিব'।

কথা সত্যি। সবার বুক কেঁপে উঠল, এখন উপায় ? মুন্নাফ বলল- 'চল্ পানি ঢাইলা ফালাইয়া দেই। যার কলসি হে আবার পুকুর থেইকা ভইরা আনবানে'।

আমাদের পরামর্শ শেষ হওয়ার আগেই সভা বেপারির বাড়ী হতে ত্রস্তপদে এক মহিলা বেরিয়ে এসে এক ঝটকায় কলসিটা কাঁখে নিয়ে রওনা দিল। গনি মন্ডলের বোন বাছিরণ। আমাদের দিকে একবার ফিরেও তাঁকাল না।

আর উপায় নাই, দোজখবাস অনিবার্য্য।

পাশের খেত থেকে একটা মাটির ঢেলা কুড়িয়ে নিয়ে কলসি তাক্ করে সজোরে ছুড়লাম। অব্যর্থ নিশানা। ঢপাৎ করে শব্দ হলো। মাটির কলসির পেট ফেটে শীতল জল বাছিরণের নিম্নাংগ পরিপ্লাবিত করে ভূতলগামী হচ্ছে। আমরা কষে দৌড়, গোপিলা ভিটার ছিটকি গাছের ঝোপের ভেতর না পৌছা পর্য্যন্ত থামাথামি নাই। সাফল্যের আনন্দে মাখনার কোদালের মতো দাতগুলি বিকশিত। আমার বুক ঢিপঢিপ করছে, যদি চিনে থাকে তা'হলে নালিশ করবে, কপালে প্রহার অনিবার্য্য।

এখন ফাগুন মাস, খাওয়ার পানির নিদারুন অভাব। গোসলের জন্যে তুরাগ আছে, ধোয়া-মোছার জন্যে বাড়ীর পাশের ডোবাগুলি। কিন্তু খাওয়ার পানি ? কদম মুন্সীর পুকুরটিই এ যাবৎ খাওয়ার পানির একমাত্র সোর্স ছিল, এ বছর তাও শুকিয়ে গেছে। পাত-কুঁয়াগুলির পানিও তলায় ঠেকেছে। এমন অবস্থায় অনর্থক একজনের পানি নষ্ট করার অপরাধ আল্লাহ কীভাবে নেবে ভেবে মন দমে গেল। এই পাপের হাত থেকে রেহাই নাই।।

আমার দোনামনা ভাব দেখে রাতে মা বললেন- 'তর কী অইছে রে, মুখটা এ্যাত শুকনা ক্যান্। কাছে আয় তো, জ্বরটর অইলনি কোন..'।

গায়ে-গতরে হাত বুলিয়ে মা আমার সুস্থ্যতা পরীক্ষাকার্য্যে ব্যস্ত, এমন সময় ফুলমতির মা এসে হাজির। মহিলা খুব ধলা, সম্পর্কে আমার চাচী। একটু হাসি দিয়ে বললেন- 'বুইরা পোলা নিয়া সোহাগ করছ বুজি ? এইবার বিয়া দিয়া একটা বউ ঘরে আন'।
মা একটা পিড়ি এগিয়ে দিয়ে বললেন- 'বয়'।
চাচী আরাম করে বসে পানের বাটা টেনে নিলেন, এখন 'সাদা' পাতা দিয়ে এক জাবর পান খাবেন। হড়বড় করে কথা বলেন এবং অসম্ভব ঝগড়াটে বলে তার বিষম অখ্যাতি। তার বড় মেয়ে ফুলমতি পাড়ার ডাকসাইটে সুন্দরী। বয়েসে আমার চেয়ে চার-পাঁচ বছর বড়। ফুলমতি বু'কে আমার খুব পছন্দ। মা যখন আয়না পরীর গল্প বলেন তখন পরীর যে চেহারা আমার চোখে ভেসে উঠে সেটা ফুলমতি বু'র। ফুলমতি বু কোনকিছু বললে আমি জান দিয়ে তা করি, সে যখন মাঝে মধ্যে আমাকে কোলে নিয়ে আদর করে, চুমা খায় তখন পরাণ শান্তিতে ভরে যায়। ফুলি বু'র সাথে আমার বিয়া হলে খুব ভাল হতো, তবে মনের গোপন ইচ্ছাটা এখন পর্য্যন্ত কারও কাছে খুলে বলি নাই।
চাচী ফিসফিস করে বললেন- 'বুজি খবর হুনছনি'?

- 'কোন্ খবর'?
- 'গাবতলীতে ব্যারাম শুরু অইছে, গেরাম উজার হওয়ার জো। জানাজা দেওয়ার লোক পাওয়া যায় না'।

মা বিষন্ন স্বরে বলেন- 'শুনছি। এসব কথা কি ছুপা রাখন যায় ? কী ডরে যে থাকি ফুলির মা। পোলাপানের ঘর, তার উপর তগো বড়মিয়া আইজ এক মাসের উপর অইল ঢাকায়...। যাউকগা, সাবধানে থাকবি, কাঁচা পানি খাবি না, পানি সব সোময় ফুটাইয়া খাবি। বাসি তরকারি বাসি দুধ এইসব কক্‌খনো পোলাপানেরে দিবি না'।
ফুলমতির মা অবাক হয়ে বলে- 'কী যে তুমি কও না বড় বুজি ! এইসব কইরা ওলা বিবিরে ঠেকাইয়া রাখন যায় ? কাইল রাইতে জৈনুদ্দি ফকিরের সাথে ওলা বিবির দেখা অইছিল। শাদা ঘোড়ায় চইড়া একচোখ কানা বিবি আমাগো গাঁয়ের দিকেই আইতেছিল, ফকির তারে খালের পাড়ে ঠেকাইয়া দিছে, গাঁয়ে ঢুকতে দেয় নাই। বইরাবরের পীর সাব আইছে, আইজ রাইতে গাঁও বান্ধন অইব'।
ফুলমতির মাকে খুব প্রত্যয়ী মনে হয়। জৈনুদ্দিন ফকিরের চোখ এড়িয়ে গাঁয়ে ঢোকা কঠিন কাজ। তাকে দেখে জ্বিন-পরীরা পর্য্যন্ত ভয় পায়। তবে ওলা বিবি বড় পিছলা, একটু বেখয়াল হলে হুট করে গাঁয়ে ঢুকে পড়ে এবং দশবিশ জনের জান নিয়ে তবে ছাড়ে। বইরাবরের পীর সাব যখন এসে গেছেন চিন্তার কোন কারণ নাই। জৈনুদ্দিন ফকির পীর সাবের প্রধান শিষ্য, মুর্শিদের দয়া হলে আসমানী বালা গাঁয়ের কাছেও ভিড়তে পারবে না।
তবুও দেখা গেল গাঁয়ের লোকের মুখে চাপা আতংকের ছাপ। গাবতলী এক নিষিদ্ধ নাম, সে গাঁয়ের দিকে লোকে ভুলেও মাড়ায় না। জোয়ান বুড়া সকলে মিলে কয়েকটি দল করেছে, তারা সারা রাত জেগে 'লাইলাহা ইল্লাল্লা'র জিকিরের সাথে মা ফাতেমা আর আলী সাবের দোহাই দিয়ে গাঁ পাহারা দেয়-
"আলীর হাতে জুলফিকার মা ফাতেমার হাতের তীর,
যেদিক থেইকা আইছ রে বালা সেই দিকেতে ফির।"
মায়ের বুকে শুয়ে রাতের বেলা যখন সেই সমবেত জিকিরের শব্দ কানে যায়, ভয়ে গা ছমছম করতে থাকে।
সেদিন সকালবেলা জানা গেল উত্তর পাড়ার হাবেজউদ্দিন সরকারের বাড়ীতে ওলা বিবি কায়েম হয়েছেন। মোন্তাজের মা ও মোন্তাজের বউয়ের একত্রে ভেদবমি শুরু হয়েছে। আওলাদের মা সাক্ষী দিল- কাল শেষ রাতে সে যখন বাইরে গেছে তখন দেখে আগুনের বংকার মতো কী একটা জিনিষ গাবতলী থেকে আমাদের গ্রামে এগিয়ে আসছে। অবশেষে

বংকাটা হাবেজউদ্দিন সরকারের বাড়ীতে ঢুকে গেল। মোস্তাজের মা-বউয়ের ভেদবমির সাথে আওলাদের মা'র গল্প হুবহু মিলে যায়। এত চেষ্টার পরও ওলা বিবিকে ঠেকানো গেল না, বড়োই আফশোস।

গাঁয়ের অবস্থা রাতারাতি পাল্টে গেল। মোস্তাজের মা-বউ একসাথে চোখ বুজল- একেবারে জোড়া কবর। মন্ডলবাড়ী ও নমশুদ্র পাড়ায় রোগ ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের পাড়াটা এখনও নিরাপদ আছে, তবে সে কতক্ষন ? এত শির্ণি, এত জিকির, এত দোহাই দেওয়ার পরও যে রোগ কথা শুনে না, তার সাথে মানুষ লড়াই করবে কীভাবে ? যাদের ভাগার উপায় ছিল তারা গ্রাম ছেড়ে ভেগে গেল। কেউ শ্বশুর বাড়ী, কেউ বাপের বাড়ী। আমাদের যাওয়ার কোন জায়গা নাই, মামার বাড়ী একদম পাশে। সুতরাং মাটি কামড়ে বাড়ীতেই পড়ে রইলাম।

সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে বাবা বাড়ী নেই। এক মাসেরও বেশী হয়ে গেছে- তিনি ঢাকায়। জমিদারির কাজে কখনো কখনো তিনি তিন-চার মাসও ঢাকায় থাকেন। রাতগুলো বড় ভয়ংকর। সন্ধা নামতেই তা যেন ভারী হয়ে মানুষের মনের উপর চেপে বসে, ঘরের বার হতেও ভয় করে। আমাদের ভাই-বোন কয়টিকে পাখনার ভেতর নিয়ে মা টিট্টি পক্ষীর মতো বসে থাকেন।

আজ মোট চারজন মারা গেছে। গনি মন্ডলের বাড়ী একজন, নমশুদ্র পাড়ায় তিনজন। সন্ধার পর মা-চাচীরা বারান্দায় বসে কীসব আলাপ করছিলেন, আমি আর মজ্জেম চৌকিতে বসে কুপীর আলোতে পারুল বুজির শ্লেটে দাগাদাগি করছিলাম। স্বাভাবিক অবস্থায় এই শ্লেট ধরা আমাদের নিষেধ। এখন আপৎকালীন অবস্থা, পারুল বুজি ফিরেও তাকান না। সুতরাং মনের সুখে ছবি আঁকছিলাম। এমন সময় ঘরের পেছনে গলা খাকারি শোনা গেল। ছোট মামা নেলন্দি মোক্তারের বিখ্যাত গলা খাকারি।

মা চঞ্চল হয়ে উঠে দাড়ালেন। ছোট মামা এলাকার মধ্যে অত্যন্ত গণ্যমান্য লোক। একে তো অঢেল জমিজমার মালিক, তার উপর কালিয়াকৈর সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে দলিল লিখে প্রচুর পয়সা কামাই করেন। তার বাড়ীতে এমনকি চা'য়ের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত আছে !

ছোট মামা বারান্দায় উঠে আসলেন, মাকে বললেন- 'কেমন আছস রহি'র মা'?

মায়ের প্রথম সন্তানের নাম রহিমা খাতুন, সুদুর টাংগাইল শহরে বিয়ে হয়েছে। প্রথম সন্তানের নাম অনুসারে মা সাধারন্যে রহির মা নামে পরিচিত।

মা কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন- 'কেমুন আর থাকুম। একে তো এই বিপদ, তার উপর আরেকজন মাসের উপর অইল ঢাকায় গিয়া বইসা আছে। একটা চিঠিও দেয় না। আমি একলা এতগুলি পোলাপান নিয়া কীভাবে থাকি'?

মামা বললেন- 'জমিদারির কামে আটকা পড়ছে, আমি আইজ ছিবলতলী কাচারিতে গেছিলাম। রহির বাপ ভালই আছে, দুই চাইর দিনের মধ্যেই আইসা পড়ব, তুমি কোন চিন্তা কইর না বইন'।

মামাকে দেখে সমস্ত ভয়ভীতি নিমেষেই উধাও, কারন তিনি শুধু মোক্তারি করেন না, একজন জবরদস্ত ফকিরও। মোক্তারির কাজে সময় পান না তাই সবসময় ফকিরাস্তি কাজ করেন না।

মামার হাতে একটা মাটির সরা। সরাটি তিনি খুব যত্নের সাথে ঘরের বরগার সাথে বেঁধে দিলেন। বাস্। এখন আর চিন্তা নাই। সরার উপর কোরান শরীফের ইয়াসিন সুরা লেখা আছে, এখন ওলা বিবির বাবারও সাধ্য নাই ঘরে ঢোকে।

মামার গলার শব্দ শুনে পাশের ঘর হতে চাচারা সবাই হাজির হয়েছেন। জমজমাট আসর। পান চিবোতে চিবোতে মামা বললেন- এই রোগ আর এক সপ্তাহ থাকবে। তার সাথে ওলা বিবির দেখা হয়েছে, তিনি তাকে করাল (প্রতিজ্ঞা) করিয়েছেন- এক সপ্তাহ পরে আমাদের গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে সে। তবে এ বছর যা গরম পড়েছে, চৈত্ মাসে শেতলা বিবির আসার সম্ভাবনা আছে। আগেভাগেই ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

রাতে শোয়ার আগে মাকে বললাম- ‘মা, মামু ওলা বিবিরে দেখবার পায় আমরা পাই না ক্যান্’?
মা বললেন- ‘দুর পাগল, সবাই সব দেখতে পায় নাকি ? তর মামা ফকির মানুষ, হে ভূতপেত্নী জ্বিনপরী সক্কলের সাথে কথা বলতে পারে’।

- ‘মা, ছোট মামু হেই যে মেদী জ্বরেরে ধমক দিছিল হেই গল্পডা কও’। আমি আব্দার ধরি।

গল্পটি বহুবার শোনা। তবুও মা’র গলায় কখনও তা পুরোনো হয় না, বার বার শুনতে ইচ্ছে করে। টুলু বুজি, পারুল বুজি, বাচ্চু ভাই সবাই বসে আছে। বুঝা গেল বড়রাও পুরোনো গল্প শুনতে কম ভালবাসে না।
সেবার আঘন মাসে বড়ভাই রাহের খুব জ্বর হলো- আকাশ পাতাল জ্বর। ফকির দাদা অনেক ঝাড়ফুক করলেন, কিন্তু জ্বরের রেমিশন নাই। সবাই বলল- মেদী জ্বর- সময় হলে ও আপনা আপনিই ছেড়ে যাবে। এই জ্বর সাধারণতঃ ৭ দিন, ১৪ দিন কিংবা সাতের গুনীতক যে কোন মেয়াদে ছেড়ে যায়। এর কোন চিকিৎসা নাই। কপাল ভাল হলে রোগী বাঁচে, খারাপ হলে অক্কা পায়। দশ বার দিন পরেও যখন জ্বর ছাড়ল না মা তখন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। এর আগে তিনি দুই দুইটা ছেলে ও একটা মেয়েকে হারিয়েছেন, ঝাড়ফুকের উপর তিনি আর ভরসা করতে পারছিলেন না।
অবশেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর কালিয়াকৈর হতে বিখ্যাত পরেশ ডাক্তারকে কল দেয়া হলো। পরেশ চক্রবর্তী এলাকার সবচেয়ে নামকরা হোমিওপ্যাথ, ভিজিট প্রথম কলে দুই টাকা পরবর্তী প্রতি কলে এক টাকা করে। বড়ভাই পরেশ ডাক্তারের হাতে পড়লেন।
এক গাঁদা টাকা খরচ হয়ে গেল, কিন্তু জ্বর কিছুতেই সারছে না। একদিন দুপুর বেলা মা বড়ভাইয়ের শিয়রে বসে আছেন, ছোট মামা ভাগ্নেকে দেখতে ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই তিনি প্রচন্ড জোরে এক হাক্ ছাড়লেন- অদৃশ্য কোন দুশমনের উদ্দেশ্যে প্রচন্ড ধমক। সেই শব্দে মা কেঁপে উঠলেন, নিঃসাড় রোগী চোখ মেলল- আর আশেপাশের ঘর হতে বৌঝিরা সব ছুটে আসল। মামা বিড়বিড় করে অনেক মন্ত্র আওড়ালেন। সর্বশেষে যে ঘটনাটি বললেন তিনি- তা যেমন চিত্তাকর্ষক তেমনই ভয়ংকর। মামা ঘরে ঢুকতেই দেখতে পান যে একজন লোক ছায়ার মতো রোগীর পায়ের কাছে বসে আছে। তাই দেখে মামা ক্রোধে হাক্ ছাড়েন। তার ধমকে লোকটি কাচুমাচু হয়ে উগারের নীচে যেয়ে লুকাল। (হাড়ি-পাতিল, ধানচাল রাখার মাঁচাকে উগার বলে)। মামা সেই মুহূর্তে রোগীকে ছেড়ে যাওয়ার নির্দ্দেশ দিলেন তাকে। লোকটি নাছোড়বান্দা, এতদিন কষ্ট করে রোগীকে প্রায় কব্জা করে এনেছে সে, বললেই কি আর এই মুহূর্তে চলে যাওয়া যায় ? তবে মামা তো আর যেই সেই লোক নন্- তার মন্ত্রের অসীম জোর। সেই জোর সহ্য করতে না পেরে লোকটি অবশেষে কাবু হয়ে পড়ল। আগামী সাতদিনের মধ্যে রোগীকে ছেড়ে চলে যাবে- এই করাল করে তবেই মামার হাত থেকে রেহাই পায় সে। সুতরাং আর কোন চিন্তা নাই, আগামী সাতদিনের মাথায় তার ছেলে সুস্থ হয়ে উঠবে- এই সংবাদে মার মুখে হাসি ফুটে।
কিবাশ্চর্য্যম ! সত্যি সত্যিই বড়ভাই আটাশ দিনের মাথায় ভাল হয়ে গেলেন, মাগুর মাছের ঝোল ও আতপ চালের ভাত দিয়ে সুদীর্ঘ্য ৪ সপ্তাহের অনশনের সমাপ্তি হলো তার।

ঘরের পেছনের আমগাছটিতে অনেক বউল এসেছে, গুটিগুলি এখনও খাওয়ার জো হয় নাই। দুই একটা মুখে দিলাম- কইষ্টা। মগডালে উঠলে নিজকে কি বড় মনে হয়, সারা দুনিয়াটা পায়ের তলায়। কাছেই একটা বরই গাছ, বরইগুলি প্রায় পেঁকে গেছে। অতিরিক্ত কাটার জন্যে বরই গাছে উঠা যায় না। সাবধানে টিনের ঘরের চালে পা দিলাম। বাস্। এবার সহজেই পাকা

বরইগুলি নাগালের মধ্যে এসে গেছে। এখন আমি বরই পেড়ে ধামা ভরে ফেলতে পারি। খুশীতে চেঁচিয়ে উঠলাম- 'এ্যাই গেদি, এ্যাই দ্যাখ্ আমি.....হিঃ হিঃ'।
গেদি খুশীমুখে বলল- 'পাড়। আমারে দে, ছানা বানাইয়া দিমুনে'।
কাঁচা-পাকা বরইকে কুচি কুচি করে কেটে কাঁচা মরিচ ও সজের কচি পাতা দিয়ে চটকালে এক অপূর্ব জিনিষ তৈরী হয়। বরই'র ছানা। লাউ পাতায় নিয়ে সেই টক-ঝাল ছানা খেতে স্বর্গীয় স্বাদ পাওয়া যায়।
লাউয়ের জাংলার নীচে বসে গেদিবুজির তৈরী ছানা খাচ্ছি, দেখি মজু তার বাহিনী নিয়ে কোথাও যাচ্ছে। হবি, মুন্নাফ, মাখন, লালমিয়া সবাই আছে। আমাকে দেখে বলল- 'যাবি'?
-'কই..'? মুখভর্তি বরই'র ছানা, কথা বলার জো নাই। কোনমতে জবাব দেই।
- 'গাঙে। সুই পক্ষী ধরুম'।
কইলজাটা ছলাৎ করে উঠল যেন। তুরাগ প্রায় শুকিয়ে এসেছে এখন, বড়রা হেটেই পার হতে পারে। তবে পানিতে প্রচন্ড ধার, ঝকঝকে বালুর উপর দিয়ে কাকচক্ষু পানি ছুটে চলেছে। খাড়া পাড়, তার মাঝে ছোট ছোট অনেক গর্ত। সেই গর্তে ছোট ছোট পাখীরা ঢুকে আবার ফুরুৎ করে বেরিয়ে যায়। লেজ সুইয়ের মতো চোখা, আমরা বলি সুই পক্ষী। এই পাখী ধরা খুব কঠিন। কাছে গেলেই কীভাবে যেন টের পেয়ে যায়- ফুরুৎ করে উড়ে যায়। আমি বহু চেষ্টা করেও একটা ধরতে পারি নাই, তবে মজু পক্ষী ধরার একজন বিশেষজ্ঞ। আজ ওর কাছে কায়দাটা শিখতে হবে।
নদীর পাড়ে পৌছাতেই আর একবার বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। ঢাকা হতে 'গয়নার নৌকা' ঘাটে ভিড়েছে, দুই জন লোকের কাঁধের উপর ভর দিয়ে কাঁচাপাকা চাপদাড়িতে ঢাকা মোটামতো এক লোক নৌকা হতে আস্তে আস্তে নামছে। একী, এ যে বাজান ! কী হয়েছে বাজানের, অন্য মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নামছে কেন ! আমার চোখে আঁধার নেমে এলো- প্রাণপনে বাড়ীর দিকে ছুটলাম।
মা বড় একটা পাতিলে করে চাইল্লা পানি (চাউল ধোয়া পানি) নিয়ে গোয়ালে যাচ্ছেন, গরুকে খাওয়াবেন। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম- 'মা মা, বাজান...'।
আমার চেঁচানিতে মা হতভম্ব, বললেন- 'কী অইছে তর, কান্দস ক্যান? কই তর বাজান...'?
আমি ফোপাতে ফোপাতে বললাম- 'বাজান গয়নার নাও থেইকা নামছে, হাটতে পারে না। মাইন্ষে ধইরা নিয়া আইতাছে..'।
বাস্, বাড়ীময় কান্নার রোল পড়ে গেল। এ কোন্ কিয়ামত নাজেল হলো ? ভাল মানুষটা বাড়ী হতে গেল, এক মাসেই এমন কি হলো যে হাটতে পারছে না, মানুষের কাঁধে ভর করে আসছে ! সবাই নদীর পাড়ে ছুটল।
নাহ্, ব্যাপার তেমন সিরিয়াস না। ঢাকা শহরে বাজান বাস-গাড়ির নীচে পড়েছিলেন। হাতেপায়ে মোচড় খেয়েছে, ডাক্তার বলেছে কয়দিন শুয়ে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কিছু নাই। বাজানকে ফিরে পেয়ে সংসারে যেন প্রাণ ফিরে আসল। আবার ছন্দ ফিরে আসবে সংসারে, বৃষ্টি হবে। সেই বৃষ্টির জলে কলেরা-বসন্তের জীবানুগুলি ধুয়ে মুছে তুরাগের বুকে মিশে যাবে। প্রাগৈতিহাসিক গ্রামটি অনেক অশ্রু ও প্রচুর হাসি নিয়ে নুতন আরেকটি বছরে প্রবেশ করবে। নুতন দিনের জাল বুনে যাবে মহাকালের বুকে।

মেজবাহউদ্দিন জওহের
মে - ২০০৫